চার্বাক অধিবিদ্যা (Cārvāka Metaphysics):

দর্শনে যেমন জগৎ ও জীবনের আলোচনা করা হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। এই জগৎ কেমন করে স্রষ্টা হল ? এ জগতে কোন স্রষ্টা আছে কিনা ? সেই স্রষ্টা কি আমাদের মত জীব, না, ঈশ্বর ? আত্মা বলে কোন তত্ত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কি না ? পরলোক বা পুনর্জন্ম আছে কি না ? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের উপজীব্য। দর্শনের যে শাখা এই সব অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে অধিবিদ্যা বলে। আমরা এখন চার্বাকের অধিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে জগতকে পাঞ্চভৌতিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটি ভূত বা উপাদান দিয়ে জগতের সৃষ্টি। কিন্তু চার্বাকরা জগতের উৎপত্তিতে চারটি ভূত বা উপাদান স্বীকার করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারটি উপাদানের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট। চার্বাকরা ব্যোম্ নামক ভূত পদার্থকে স্বীকার করে। কেননা তাদের মতে ব্যোমের প্রত্যক্ষ হয় না। আর যার প্রত্যক্ষ হয় না তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। চার্বাকের এই মতবাদকে জড়বাদ বলা হয়। কারণ চার্বাক মতে জগতের মধ্যে জড় পদার্থ ভিন্ন কোন চেতন সত্তা নেই। যাকে আমরা চৈতন্য বলি তা জড় পদার্থের একপ্রকার সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন হয়। চৈতন্য জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন গুণবিশেষ। এই চৈতন্য কোন একটি জড় পদার্থের মধ্যে পৃথকভাবে থাকে না। কিন্তু সকল প্রকার জড় পদার্থের সংমিশ্রণ থেকে চৈতন্য নামক এক আগন্তুক গুণের উদয় হয়। পান, চুণ, সুপারী ও খয়ের – এই চারটি উপাদানের কোনটির মধ্যেই পৃথকভাবে রক্তিমাভা বা লালচে রং থাকে না। কিন্তু ঐ চারটি উপাদানকে যখন একত্রে চর্বণ করা হয় তখন ঐ প্রকার সংমিশ্রণ থেকে রক্তিমবর্ণ উৎপন্ন হয়। চার্বাকরা আর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাদের মতকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। ভাতের মধ্যে জল ঢেলে যদি কয়েকদিন রাখা হয় তবে ঐ প্রকার পচনশীল অন্নে মাদকতা দেখা দেয়। মাদকতা জল বা ভাত কোনটির মধ্যে পৃথকভাবে থাকে না। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ থেকে ঐ গুণটির উদ্ভব হয়। চৈতন্যও অনুরূপভাবে ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন আগুন্তুক গুণবিশেষ। যকৃৎ যেমন পিত্ত নিঃসরণ করে, দেহ অথাৎ ভূতচতুষ্টয় তেমনি চৈতন্য উৎপন্ন করে। চার্বাকের এই মতকে তাই ভূতচৈতন্যবাদও বলা হয়।

জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে চার্বাকের মতবাদের যেমন গঠনমূলক ও ধ্বংসমূলক দিক আমরা। দেখতে পাই, অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও চার্বাকের দৃষ্টিভঙ্গীও তেমনি দু'প্রকার – ইতিবাচক ও নেতিবাচক। অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে, চার্বাকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তার জড়বাদ বা

ভূতচৈতন্যবাদের মধ্যে। কিন্তু চার্বাকের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে আত্মতত্ত্বের খণ্ডনের মধ্যে, পুনর্জন্ম খণ্ডনের মধ্যে, কর্মবাদ অস্বীকার করার মধ্যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারের মধ্যে, এমন কি কার্যকারণ সম্বন্ধ অস্বীকারের মধ্যে। আমরা এখন চার্বাকে অধিবিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদের এই ধ্বংসমূলক দিকটির আলোচনা করব।

কর্মবাদ ও পুনর্জন্মের খণ্ডন (Rejection of the doctrine of Karma and Rebirth):

চার্বাক ভিন্ন সকল ভারতীয় দার্শনিকই কর্মফলের নিয়ম স্বীকার করেন। কর্মবাদ অনুসারে 'যে যেমন কর্ম করে তেমন সে ফল তার পায়। যে চাষী আলস্যভরে বীজ না বপন করে পক্ক শস্য পাইবে সে কোথায় ?' আমাদের যাবতীয় কর্মকে সৎ ও অসৎ এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সৎ কর্ম করলে সুখ পাওয়া যায়, আর অসৎ কর্মের ফল দুঃখভোগ। শাস্ত্রেও সুকর্মের ফল পুণ্য এবং কুকর্মের ফল পাপ বলা হয়েছে। পাপ ও পুণ্যভেদে জীব দুঃখ বা সুখ ভোগ করে থাকে।

চার্বাকরা এরূপ কর্মবাদ স্বীকার করে না। জগতের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে অসৎ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি সুখ ভোগ করছে, আর সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করেও অনেকে দুঃখ ভোগ করছে। কাজেই কর্ম অনুসারে ফললাভ এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকায় কর্মবাদ গৃহীত হতে পারে না। অনেকে অবশ্য কর্মবাদ নিয়মকে রক্ষা করার জনা জন্মান্তরবাদের কথা বলেন। এ জন্মে সৎ কর্মের অনুষ্ঠান সত্বেও যে ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করছে তার কারণ হিসাবে পূর্বজন্ম কৃত কর্মকে খাড়া করা হয়। আর বর্তমানে সৎ কর্মের ফল পরবর্তী জন্মে লাভ হবে এরূপ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু চার্বাকরা পূর্বজন্ম বা পরজন্ম মানেন না। তাঁদের মতে দেহ ভস্মীভূত হওয়ার সাথে সাথে আত্মাও ভস্মীভূত হয়। এটি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কাজেই পূর্বজন্ম বা পরজন্মের প্রত্যক্ষ না হওয়ায় তাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হতে পারে না।

চার্বাকের এই মতবাদও যুক্তিগ্রাহা নয়। প্রকৃতপক্ষে, কর্মবাদের নিয়ম না মানলে জগতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য দেখা দেবে। তাছাড়া আমাদের নৈতিক আচরণও কর্মবাদের নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাই কর্মবাদ না মানলে নৈতিক আচরণ মূল্যহীন ও অসার হয়ে পড়বে। অথচ বাস্তবজীবনে নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়ার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা বা বিশৃঙ্খলার আমন্ত্রণ। সর্বোপরি, আমরা জাতিস্মরের কথা শুনতে পাই যারা পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করে। Parapsychology- তে জাতিস্মর নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে নিশ্চয় হয়েছে যে জন্মান্তর অস্বীকার করা যায় না।

জগতের স্রষ্টারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন (Rejection of God as the creator of the world) :

জগতের স্রষ্টা হিসাবে ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরকে আগম বা শব্দ প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। 'দ্যাবাভূমি জনয়ন দেব এক' অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্তের স্রষ্টা একজন দেবতা আছেন; কিংবা 'বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা' অর্থাৎ এই পৃথিবীর স্রষ্টা ও পালয়িতা' ইত্যাদি শ্রুতিবাকা থেকে ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব জানা যায়। নৈয়ায়িকরা শ্রুতিপ্রমাণ ছাড়া ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনুমান প্রমাণের অবতারণা করেছেন। ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্যের কর্তা আছে যেহেতু ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্য। ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাৎ, ঘটবৎ। যেমন ঘটাদি কার্যের কুম্ভকার রূপ একজন কর্তা স্বীকার করতে হয়, তেমনি ক্ষিত্যঙ্কুরাদি (প্রথমোৎপন্ন কার্য) বা জগৎ রূপ কার্যের একজন কর্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। জগতের কর্তা আমাদের মত কোন জীব হতে পারে না। কেননা, কর্তা হতে গেলে ' উপাদানগোচর অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা কৃতিমত্ব' থকা চাই। কর্তা হতে গেলে উপাদানের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং কার্য উৎপন্ন করার ইচ্ছা থাকা চাই। মৃত্তিকা থেকে যে ঘট উৎপন্ন হয় সেই মৃত্তিকারূপ উপাদানের অপরোক্ষ জ্ঞান কুম্ভকারের থাকে। আবার কুম্ভকারের ঘট উৎপন্ন করার ইচ্ছাও থাকে। ফলে কুম্ভকারকে ঘটকর্তা বলা যায়। কিন্তু ন্যায় মতে এই জগতের সমবায়ি (উপাদান) কারণ পরমাণু। এই পরমাণু অতি সূক্ষ। কাজেই কোন জীবের পক্ষে পরমাণুর প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। তাই জীবের পক্ষে জগৎ রূপ কার্যের কর্তা হওয়াও সম্ভব নয়। অতএব জগতের কর্তারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হয়।

চার্বাকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেননা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না। অনুমান লব্ধ জ্ঞান কখনই নিঃসংশয় হতে পারে না। কেননা অনুমানের ক্ষেত্রে যে ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকে তার নিশ্চয় সম্ভব নয়। তাছাড়া চার্বাকরা নৈয়ায়িক প্রদত্ত অনুমানের বিরুদ্ধে সৎপ্রতিপক্ষ উথ্থাপন করেছেন। যস্য সাধ্যাভাব সাধকং হেত্বন্তরং বিদ্যতে স সৎপ্রতিপক্ষ। অর্থাৎ যার সাধ্যাভাবের সাধক অপর প্রবল হেতু বর্তমান তাকে সৎপতিপক্ষ বলে। সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য অপরের অনুমানকে হীনবল বা দুর্বল করা। সৎপ্রতিপক্ষ হ'লে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত হয় না বটে, কিন্তু অপরের মতও প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাতে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মত। মোট কথা, সৎপ্রতিপক্ষ থাকলে কারো মতই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। চার্বাক যে সংপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করেছেন তার আকার হল : ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকং অকর্তৃকং শরীরজন্যত্বাৎ। অর্থাৎ ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্যের কর্তা নেই যেহেতু তার শরীর নেই। এই অনুমানে ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকে পক্ষ করা হয়েছে, অকর্তৃত্বকে (অর্থাৎ সকর্তৃত্বের অভাব) সাধ্য করা হয়েছে। আর সাধ্যকে সিদ্ধ করার

জন্য তুল্যবলবিশিষ্ট (মূল অনুমানের কার্যত্ব হেতুর মত) হেতু শরীরাজন্যত্বের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই হেতুটি সাধ্যকে সিদ্ধ করতে সক্ষম কেননা যেখানে যেখানে শরীরের অভাব আছে সেখানে সেখানে কর্তৃত্বের অভাব আছে - এরূপ ব্যাপ্তি পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আকাশ। আকাশের কোন কর্তা নেই যেহেতু তার শরীর নেই। যাহোক, আমরা ঘটকার্যের কর্তারূপে যে কুম্ভকারকে স্বীকার করি তার একটা শরীর আছে। শরীরহীন কর্তা আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে না। কাজেই ক্ষিত্যঙ্কুরাদি বা জাতের কর্তারূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হতে পারেন না। কেননা ঈশ্বরের শরীর নেই।

শ্রুতিপ্রমাণের বিরুদ্ধে চার্বাকদের বক্তব্য হ'ল শ্রুতিপ্রমাণ গ্রাহ্য নয়। কেননা শ্রুতি বা। বেদ কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির রচনা নয়। শ্রুতিতে আছে, ইহলোকে প্রদত্ত পিণ্ড পরলোকী আত্মাকে তৃপ্ত করে। যদি তাই হয় তবে বিদেশে ভ্রমণরত আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে প্রদত্ত অন্ন তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। বেদের মধ্যে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা অপরকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে। বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের সিংহভাগ পুরোহিতের ভাগ্য জোটে; যজমানের ভাগ্যে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই জোটে না। তাছাড়া বেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী উক্তিও দেখা যায়। কোথাও এক ঈশ্বরের কথা আছে; কোথাও বা বহু ঈশ্বরের কথা আছে। কোন বেদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদের অনুকূলে। আবার কোন বেদের মধ্যে স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদের কথা বলা হয়েছে। কাজেই বেদবাক্য স্ববিরোধ যুক্ত হওয়ায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

চার্বাকের এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য নয়। চার্বাকরা ঈশ্বরানুমানে যে সৎপ্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করেছেন নৈয়ায়িকরা তার খণ্ডন করেছেন। ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথ বলেছেন যে, চার্বাক সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা হ'লে সংশয়ের নিবর্তক কোন অনুকুল তর্ক নেই। কিন্তু ন্যায় সিদ্ধান্তে সংশয় করা হলে সংশয় নিবারক অনুকূল তর্ক আছে। তাই ন্যায়হেতুটি প্রয়োজক; কিন্তু চার্বাক হেতুটি অপ্রয়োজক। এইজন্য চার্বাক উত্থাপিত সৎপ্রতিপক্ষ যথার্থ সৎপ্রতিপক্ষ বলে গণ্য হতে পারে না। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে দাঁড়াবে এইরকম : যদি কেউ সংশয় করে বলে জগতের কর্তা থাকুক, কিন্তু তার শরীর না থাকুক তাহলে সেই সংশয় দূর করার মত কোন অনুকুল তর্ক চার্বাকের নেই। কিন্তু ন্যায়মতে সংশয় করে যদি বলা হয় ক্ষিত্যঙ্কুরাদি কার্য হোক, কিন্তু তার কর্তা না থাকুক, তাহলে সেই সংশয় দূর করার জন্য অনুকুল তর্ক আছে। কার্য যদি সকর্তৃকত্বের ব্যভিচারী হয় তাহলে কর্তৃজন্য হয় না। কিন্তু কার্য মাত্রেই কর্তার ইচ্ছা জন্য। ‘কৃ’

ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে কার্যটি নিষ্পন্ন। এই কার্যের অর্থ হল যা কর্তার ইচ্ছা জন্য। কাজেই কার্য আছে অথচ কর্তা নেই – এমন কথা বললে বিরোধ দেখা দেবে। উদনাচার্যও শরীরাজন্যত্ব হেতুটিতে দোষ দেখিয়ে সৎপ্রতিপক্ষ খণ্ডন করেছেন তাঁর যুক্তি হল : হেতুতে শরীর পদ ব্যর্থ। কেননা কেবল অজন্যত্ব থেকে অকর্তৃকত্বের অনুমান করা যেত। ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত হেতু থেকে যে দোষ হয় তার নাম ব্যাপাত্বাসিদ্ধ। এই দোষ এড়ানোর জন্য যদি কেবল অজন্যত্বকে হেতু করা হয় তাহলে স্বরূপাসিদ্ধ দোষ হয়। হেতুর অভাববিশিষ্ট পক্ষকে স্বরূপাসিদ্ধ বলে। অজন্যত্ব হেতুটি পক্ষ ক্ষিত্যঙ্কুরাদিতে থাকে না। কেননা ক্ষিত্যঙ্কুরাদি জন্য মাত্র। ফলে শরীরাজন্যত্ব হেতুটি সদ্ধেতু বলে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং চার্বাক যে সৎপ্রতিপক্ষের অভিযোগ আনেন তা যথার্থ হতে পারে না।